অধ্যায় ৪

মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন
Human Physiology : Blood & Circulation

মানবদেহের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এর নাম **রক্ত সংবহনতন্ত্র**। **রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ এবং হৃৎপিন্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে**। ব্রিটিশ চিকিৎসক Willium Harvey, ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্ত সংবহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেন। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং এর কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- রক্ত
- লসিকা
- রক্ত তঞ্চন
- হৃৎচক্র
- ব্যারোরিসেপ্টর
- অ্যানজিনা
- পেসমেকার
- প্লাক

পিরিয়ড সংখ্যা-১৪ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্যবহারিক : রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ৪. হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৫. হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পাবে। ৮. মানবদেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে। ৯. হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেস মেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্তকণিকা ও লসিকা ● রক্ত জমাট বাঁধা ● **ব্যবহারিক** ○ রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ● হৃৎপিন্ডের গঠন ● হার্টবিট, বিভিন্ন দশা ও এর নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ● রক্তচাপ ও ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা ● মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র ○ সিস্টেমিক সংবহনতন্ত্র ○ পালমোনারি সংবহন ● হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় ○ বুকের ব্যাথা ○ হার্ট এটাক ○ হার্ট ফেইলিউর ● হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ○ পেস মেকার কার্যক্রম ○ ওপেন হার্ট সার্জারী ○ করোনারি বাইপাস ○ এনজিওপ্লাস্টি

রক্ত (Blood)

মানবদেহে রক্তনালিকাসমূহের ভিতর দিয়ে নিরন্তর প্রবহমান লাল বর্ণের অস্বচ্ছ, সামান্য ক্ষারীয়, চটচটে, লবণাক্ত প্রকৃতির **তরল যোজক টিস্যুকে** (connective tissue) **রক্ত** বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫–৬ লিটার রক্ত থাকে অর্থাৎ দৈহিক মোট ওজনের প্রায় ৮%। রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। এর p^H মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি, প্রায় ১.০৬৫। অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্তের স্বাদ নোনতা। সুনির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের সবখানে সঞ্চালিত হয়।

রক্তের উপাদান (Components of Blood)

টেস্টটিউবে রক্ত নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে মিনিটে ৩০০০ বার করে ৩০ বার ঘুরালে রক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। উপরের হাল্কা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% যে অংশ থাকে তা **রক্তরস** বা **প্লাজমা** (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি ৪৫% অংশ **রক্তকণিকা** (blood corpuscles)। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়।

রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)

রক্তরস (বা প্লাজমা) হচ্ছে রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০-৯২% এবং কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮-১০%। রক্তরসের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন জৈব (৭-৯%) ও অজৈব (০.৯%) উপাদান গঠিত। তা ছাড়া, কয়েক ধরনের গ্যাসও রক্তরসে পাওয়া যায়। রক্তরসে নিম্নোক্ত **উপাদানগুলো** পাওয়া যায়।

অজৈব পদার্থ (Inorganic constituents) : রক্তরসে অজৈব পদার্থের পরিমাণ প্রায় ০.৯%। এদের সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জৈব পদার্থ (Organic constituents) : রক্তের জৈব উপাদানগুলো হচ্ছে:

i. প্লাজমা প্রোটিন (Plasma protein) : জৈব পদার্থের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৭.৫%। প্রোটিনের মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ii. নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ (Nitrogenous excretory products): রেচন পদার্থের রয়েছে- ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

iii. অন্যান্য পদার্থ : গ্লুকোজ, ফ্যাট, কোলেস্টেরল, হরমোন, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম ইত্যাদি রক্তরসে করে। বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, রঞ্জক পদার্থ (বিলিরুবিন, ক্যারোটিন, জ্যাস্থোফাইলিন) ইত্যাদিও রক্তরসে বিদ্য

রক্তরসের কাজ : (i) প্লাজমা রক্তের তরলতা রক্ষা করে এবং ভাসমান রক্ত কণিকাসহ অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ সর্বত্র পরিবাহিত হয়। (ii) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গে বাহিত (iii) টিস্যু থেকে যে সব বর্জ্যপদার্থ বের হয় তা রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়। (iv) টিস্যুর অধিকাংশ কার্বন ডাইঅ রক্তরসে বাইকার্বনেটরূপে দ্রবীভূত থাকে। (v) অল্প পরিমাণ অক্সিজেন এতে বাহিত হয়। (vi) লোহিত কণিকায় হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়। (vii) রক্তরসের মাধ্যমে হরমোন, এনজাইম, লিপিড বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়। (viii) রক্তরস রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। (ix) রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়ে উপাদানগুলো পরিবহন করে। (x) যকৃত, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে উৎপন্ন তাপ শক্তিকে সমগ্র দেহে পরিবহন করে তাপের সাম্যতা রক্ষা করে।

নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

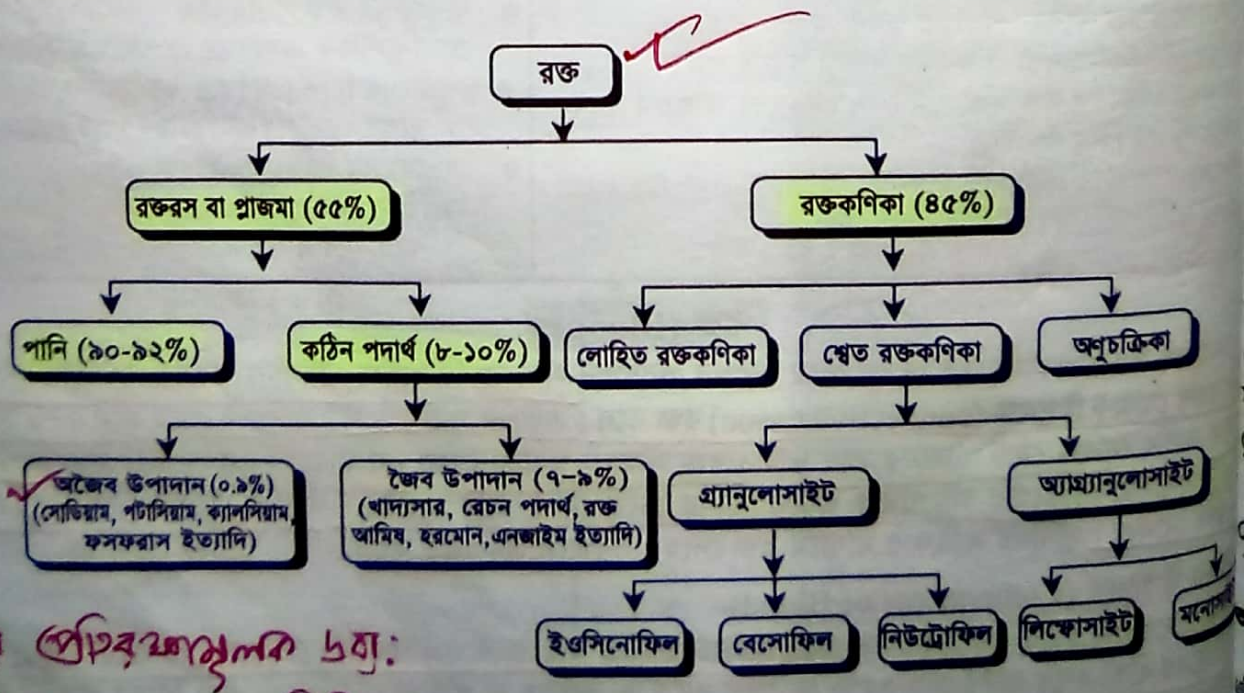

প্রতিটি RBC তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ 29 Pico g.

রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)

রক্তরসে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকা প্রধানত তিন রকম, যথা-লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট, শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট।

১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte; গ্রিক, *erythros* = লোহিত + *kytos* = কোষ)

মানুষের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা গোল, দ্বিঅবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো ও লাল বর্ণের। এর কিনারা মসৃণ এবং মধ্যাংশের চেয়ে পুরু। পরিণত কণিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। প্রত্যেক লোহিত রক্তকণিকার গড় ব্যাস ৭.৩μm এবং গড় স্থূলতা ২.২μm। মধ্যভাগের স্থূলতা 1μm

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছেঃ ভ্রূণদেহে ৮০-৯০ লাখ; শিশুর দেহে ৬০-৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষে ৫০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে ৪৫ লাখ। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন-ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লাখের চেয়ে ২৫% কম হলে **রক্তাল্পতা** (anaemia) দেখা দেয়। কিন্তু এ সংখ্যা কোনো কারণে ৬৫ লাখের বেশি হলে তাকে **পলিসাইথেমিয়া** (polycythemia) বলে।

প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু **হিম** (heme) নামক লৌহ ধারণকারী **রঞ্জক** (pigment) এবং **গ্লোবিন** (globin) নামক প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে প্রায় ১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিনের চারটি পলিপেপটাইড চেইনের সাথে একটি হিম গ্রুপ যুক্ত থাকে। হিম গ্রুপের জন্যই রক্ত লাল হয়।

অস্থিমজ্জায় অবস্থিত **স্টেম কোষ** (stem cell) বা **হিমোসাইটোব্লাস্ট** (hemocytoblast) নামক বড় ভ্রূণীয় কোষ থেকে এরিথ্রোসাইটের সৃষ্টি হয়। এরিথ্রোসাইট সৃষ্টিকে **এরিথ্রোপোয়েসিস** (erythropoesis) বলে। এদের জীবনকাল প্রায় 8 মাস। এ সময়কালে এটি বার বার কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদসহ প্রায় ১১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। নিউক্লিয়াস না থাকায় এ কোষের আয়ু কম। কণিকাগুলো যকৃত ও প্লীহায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

রাসায়নিকভাবে লোহিত কণিকার ৬০-৭০% পানি এবং ৩০-৪০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% হিমোগ্লোবিন। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম, ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

লোহিত কণিকার কাজ : (i) লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 এবং সামান্য পরিমাণ CO_2 পরিবহন করে। (ii) রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে। (iii) এগুলোর হিমোগ্লোবিন অন্যান্য অন্তঃকোষীয় বস্তু বাফাররূপে রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে। (iv) প্লাজমাঝিল্লিতে অ্যান্টিজেন প্রোটিন যুক্ত থাকে যা মানুষের রক্ত গ্রুপিংয়ের জন্য দায়ী। (v) এসব কণিকা রক্তে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপন্ন করে।

২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocyte; গ্রিক *leucos* = বর্ণহীন, *kytos* = কোষ) :

মানবদেহের পরিণত শ্বেত কণিকা হিমোগ্লোবিনবিহীন, অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় কোষ। কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না বলে এদের শ্বেত রক্তকণিকা নামে ডাকা হয় (প্রকৃত পক্ষে বর্ণহীন)। এ রক্তকণিকাকে দেহের **ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক** (mobile defensive unit) বলে কারণ এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। মানুষের শ্বেত রক্তকণিকা নির্দিষ্ট আকারবিহীন। প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্কাকার ও অশ্বক্ষুরাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রান্তে অবস্থান নেয়। এগুলো লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে বড়, গড় ব্যাস আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ৭.৫-২০μm। মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বেড়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত ৭০০ : ১।

শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিওপ্রোটিনসমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ক. **দানাবিহীন** বা **অ্যাগ্র্যানুলোসাইট** (agranulocytes) এবং খ. **দানাদার** বা **গ্র্যানুলোসাইট** (granulocytes)।

ক. দানাবিহীন বা অ্যাগ্রানুলোসাইট (Agranulocyte) : এ ধরনের লিউকোসাইটে সাইটোপ্লাজম দানাহীন, স্ব এবং নিউক্লিয়াসটি বড় ও অখন্ডায়িত। এটি আবার নিম্নোক্ত দু'রকম -

i. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) : লিম্ফোসাইটে একটি বৃহৎ গোলাকার নিউক্লিয়াস এবং তুলনামূলকভাবে অ সাইটোপ্লাজম থাকে। এদের ব্যাস ১০-১৮ মাইক্রোমিটার। সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ, দানাবিহীন ও ক্ষারাসক্ত। এ আবার দুই প্রকার। যথা- B - লিম্ফোসাইট ও T- লিম্ফোসাইট। এদের ব্যাস ৭-২২ মাইক্রোমিটার। এ অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং কিছু অণুজীব ধ্বংস করে।

ii. **মনোসাইট** (Monocyte) : মনোসাইটে অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াসটি প্রাথমিক অবস্থায় গোলাকার অথ ডিম্বাকার থাকে এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্কের মতো অথবা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখায়। এ সাইটোপ্লাজম বেশি থাকে। এদের ব্যাস ১০-১৮ মাইক্রোমিটার । এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** পদ্ধতিতে রো জীবাণু ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে।

চিত্র ৪.১ : মানুষের রক্তের উপাদান

খ. দানাদার বা গ্রানুলোসা (Granulocyte) : এ ধরনের লিউকোসা সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত এবং নিউক্লিয় ছোট ও খন্ডকযুক্ত। দানাগুলো **বিশে রঞ্জকে** নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণ গ্র ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে একোষগুলো নিম্নোক্ত তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

i. **নিউট্রোফিল** (Neutrophil) : কোষের সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত। নিউক্লিয়াস ২-৭ টি খন্ডক যু এদের ব্যাস ১০-১২ মাইক্রোমিটার। ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে।

ii. **ইওসিনোফিল** (Eosinophil) : এ কোষের সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত, অম্লধর্মী। দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লা বর্ণ ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস সাধারণত ২ খণ্ডকযুক্ত হয়। এদের ব্যাস ১০ - ১২ মাইক্রোমিটা এগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

iii. **বেসোফিল** (Besophil) : এ কোষের সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষারধর্মী। এগুলো ক্ষারাস হয়ে **নীল** বর্ণ ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস দুই খণ্ডক যুক্ত এবং বৃক্কাকার। এদের ব্যাস ৮-১০ মাইক্রোমিটা বেসোফিল **হিস্টামিন** নিঃসরণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং **হেপারিন** নিঃসরণ করে রক্ত রক্তনালির মধ্যে জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান করে।

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ : (i) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জী ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। (ii) লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে (এজন্য এদের আণুবীক্ষণি সৈনিক বলে)। বেসোফিল **হেপারিন** (heparin) উৎপন্ন করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamin) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (iv) নিউট্রোফিল বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (v) ইওসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডি ধ্ব করে।

৩. অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট (Thrombocytes or Platelets) :

থ্রম্বোসাইট ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা, দেখতে গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাদার কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। এগুলো ব্যাস প্রায় ৩μm, তবে, ৪-৫μm ব্যাসসম্পন্ন বড় আকারের থ্রম্বোসাইটও দেখা যায়। পরিণত মানবদেহে প্র ঘনমিলিমিটার রক্তে থ্রম্বোসাইটের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ। অসুস্থ দেহে এগুলোর সংখ্যা আরও বে হয়। প্রতিটি থ্রম্বোসাইট দানাময় সাইটোপ্লাজম, গহ্বর, পিনোসাইটিক গহ্বর ও অন্যান্য কোষ-অঙ্গাণুবিশিষ্ট এবং এ ঝিল্লিতে আবৃত। এতে প্রোটিন ও প্রচুর পরিমাণ সেফালিন নামক ফসফোলিপিড থাকে। থ্রম্বোসাইটের উৎপত্তি সম্

মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, লাল অস্থিমজ্জার বড় **মেগাক্যারিওসাইট** (megakaryocyte) থেকে এদের উৎপত্তি হয়। অন্যদের মতে, শ্বেত রক্তকণিকা থেকে থ্রম্বোসাইটের সৃষ্টি হয়।

থ্রম্বোসাইটের গড় আয়ু প্রায় ৫-১০ দিন। আয়ু শেষ হলে থ্রম্বোসাইট প্লীহা ও অন্যান্য রেটিকুলো-এন্ডোথেলিয়াল কোষে বিনষ্ট হয়।

অণুচক্রিকার কাজ : (i) ক্ষতস্থানে রক্ততঞ্চন ঘটায় এবং **হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ** (hemostatic plug) গঠন করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। (ii) রক্তনালির ক্ষতিগ্রস্থ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন করে। (iii) **সেরাটোনিন** নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে। (iv) **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় কার্বন কণা, ইমিউন কমপ্লেক্স ও ভাইরাসকে ভক্ষণ করে। (v) হিস্টামিন ও 5HT সঞ্চয় করে।

রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting)

যে প্রক্রিয়ায় ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হওয়া রক্তের প্লাজমা থেকে ফাইব্রিনোজেন আলাদা হয়ে ক্ষতস্থানে ফাইব্রিন জালক নির্মাণের মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে ফলে রক্তের অবশিষ্টাংশ থকথকে পিণ্ডে পরিণত হয় সে প্রক্রিয়ার নাম **রক্ত তঞ্চন** বা **রক্তের জমাট বাঁধা**।

রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না, কারণ সেখানে **হেপারিন** (heparin) নামে এক পদার্থ সংবহিত হয়। কিন্তু দেহের কোনও অংশে ক্ষত সৃষ্টি হলে রক্ত যখন দেহের ক্ষত অংশ থেকে বের হতে থাকে তখন ঐ অংশের অণুচক্রিকাগুলো বাতাসের সংস্পর্শে ভেঙ্গে যায় এবং ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে।

রক্তরসে অবস্থিত ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factor) রক্ত তঞ্চনে অংশ নেয়। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো- (i) ফ্রাইব্রিনোজেন, (ii) প্রোথ্রম্বিন, (iii) থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও (iv) Ca++। এগুলোর ধারাবাহিক কার্যকারিতার ফলে ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। সংক্ষেপে রক্ত জমাট বাঁধার কৌশলটি তুলে ধরা হলো-

১. দেহের কোন অংশে ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখান থেকে নির্গত রক্তের অনুচক্রিকাগুলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভেঙ্গে যায় এবং **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** (thromboplastin; ক্লটিং ফ্যাক্টর) নামক প্লাজমা প্রোটিন উৎপন্ন হয়।

২. থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং রক্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে **প্রোথ্রম্বিন** (prothrombin; ক্লটিং ফ্যাক্টর II); নামক গ্লাইকোপ্রোটিনের সাথে ক্রিয়া করে সক্রিয় **থ্রম্বিন** (thrombin) এনজাইম উৎপন্ন করে।

৩. থ্রম্বিন রক্তে অবস্থিত **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen; ক্লটিং ফ্যাক্টর I) নামক দ্রবণীয় প্লাজমা প্রোটিনের সাথে মিলে **ফাইব্রিন** (fibrin) নামক অদ্রবণীয় প্রোটিন সূত্রের সৃষ্টি করে।

৪. এভাবে সৃষ্ট সূত্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জালকের আকার ধারণ করে।

৫. ফাইব্রিনের জালকে লোহিত রক্তকণিকাগুলো আটকে যায়। ফলে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায় (মানুষে রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক সময় ৪-৫ মিনিট)। রক্ত ক্ষরণের ১-৪ মি.

জমাট বাঁধা রক্ত থেকে যে হালকা হলুদ বর্ণের তরল জলীয় অংশ বেরিয়ে আসে তাকে রক্তের **সিরাম** (serum) বলে। সিরাম বস্তুতপক্ষে রক্তরস, তবে এতে ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চন ফ্যাক্টর II, V ও VIII থাকেনা।

ক্লটিং ফ্যাক্টর
ফ্যাক্টর - I বা ফাইব্রিনোজেন
ফ্যাক্টর - II বা প্রোথ্রম্বিন
ফ্যাক্টর - III বা থ্রম্বোপ্লাস্টিন
ফ্যাক্টর - IV বা ক্যালসিয়াম
ফ্যাক্টর - V বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাকসেলারিন
ফ্যাক্টর - VI বা অ্যাকসেলারিন
ফ্যাক্টর - VII বা স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারটিন
ফ্যাক্টর - VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর
ফ্যাক্টর - IX বা ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর
ফ্যাক্টর - X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর
ফ্যাক্টর - XI বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট (PTA)
ফ্যাক্টর - XII বা হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর
ফ্যাক্টর - XIII বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর

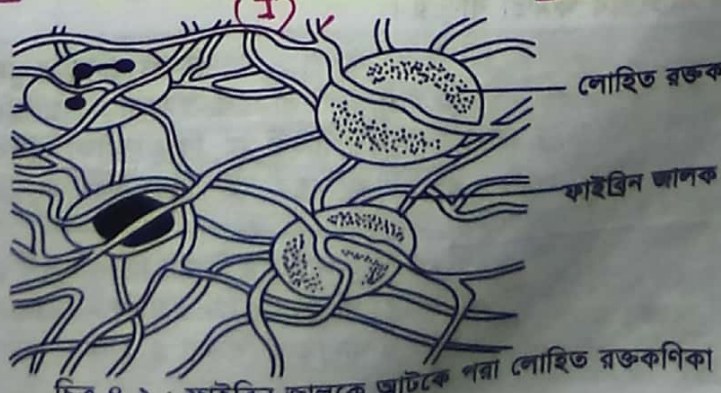

চিত্র ৪.২ : ফাইব্রিন জালকে আটকে পরা লোহিত রক্তকণিকা

লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

লসিকানালি ও লসিকাগ্রন্থিতে অবস্থিত যে স্বচ্ছ, ঈষৎ হলুদ, ক্ষারীয় পরিবর্তিত টিস্যুরস কোষে পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ করে এবং দেহের প্রতিরক্ষামূলক কাজে অংশ নেয় তাকে **লসিকা** বা **লিম্ফ** বলে। দেহের সমস্ত টিস্যু কৈশিকজালিকায় (capillaries) বেষ্টিত থাকে। রক্তের কিছু উপাদান কৈশিকজালিকার প্রাচীর ভেদ করে কোষের চারপাশে অবস্থান করে। এ উপাদানগুলোকে সম্মিলিতভাবে **লসিকা** বা **লিম্ফ** বলে। এ টিস্যুরসে লোহিত কণিকা, অণুচক্রিকা ও রক্তে প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রোটিন অনুপস্থিত।

লসিকার উপাদান : লসিকাকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়, যেমন **কোষ উপাদান** ও **কোষবিহীন উপাদান**। লসিকার কোষ উপাদান হলো শ্বেতকণিকার **লিম্ফোসাইট**। প্রতি ঘন মিলিলিটার লসিকায় প্রায় ৫০০–৭৫০০০ লিম্ফোসাইট রয়েছে। লসিকার কোষবিহীন উপাদানের মধ্যে রয়েছে ৯৪% পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রোটিন, লিপিড, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি, অজৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রধান। লসিকায় অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন ও সামান্য প্রোথম্বিন জাতীয় প্রোটিন থাকে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল** (chyle) বলে।

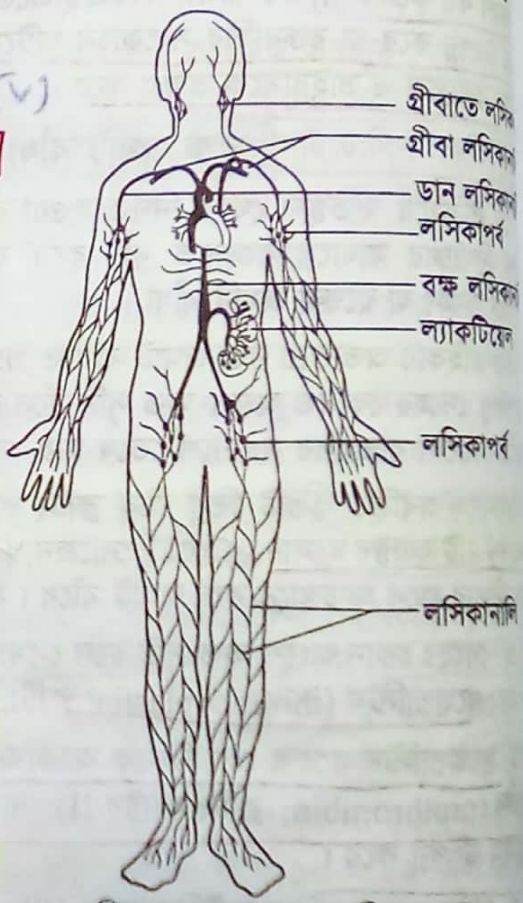

চিত্র ৪.৩ : মানুষের লসিকাতন্ত্র

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) : যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকা রস প্রবাহিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। লসিকানালি ও লসিকাপর্ব বা লসিকাগ্রন্থির সমন্বয়ে লসিকাতন্ত্র গঠিত। যে বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের **লসিকানালি** (lymp vessels) বলে। অন্ত্রের প্রাচীরে সুবিকশিত লসিকানালিগুলোকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। লসিকানালিতে কিছুটা পর পর এক ধরনের গোল বা ডিম্বাকার স্ফীতি দেখা যায়। এগুলো **লসিকা পর্ব** (lymph nodes) বা **লসিকা গ্রন্থি** (lymph gland)। এদের সংখ্যা ৪০০–৭০০। প্লীহা (spleen), টনসিল (tonsil), অ্যাডেনয়েড (adenoid) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লসিকাপর্ব। এগুলো গ্রীবা, বগল ও কুঁচকিতে বেশি থাকে।

লসিকার কাজ : (i) আন্তঃকোষীয় উন্মুক্ত স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন অণু লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে। (ii) যেসব লিপিড কণা কৈশিকনালিকার সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রম করতে পারে না সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। (iii) দেহের যেসব টিস্যুতে রক্ত পৌঁছাতে পারেনা লসিকার মাধ্যমে সেসব টিস্যুতে পুষ্টি ও অক্সিজেন পরিবাহিত হয়। (iv) লসিকাস্থিত শ্বেত কণিকা (লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট) দেহের প্রতিরক্ষায় অবদান রাখে। (v) লসিকা থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

রক্ত ও লসিকার তুলনা

১. রক্ত লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু, লসিকা সামান্য হলুদ বর্ণের পরিবহন টিস্যু।
২. রক্ত রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু লসিকা লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩. রক্ত প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে লসিকা প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪. রক্তে হিমোগ্লোবিন উপস্থিত কিন্তু লসিকায় হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।
৫. রক্ত বেশি পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত। লসিকা অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬. রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়, লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যকণা (চর্বি) পরিবাহিত হয়।

মানবদেহের রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

রক্তকণিকা		সংখ্যা (প্রতি ঘন মিমি রক্তে)	উৎসস্থল	গঠন বৈশিষ্ট্য	কাজ	আয়ুষ্কাল
লোহিত রক্তকণিকা		৫০ লক্ষ	ভ্রূণাবস্থায় যকৃত ও প্লীহা এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা।	গোলাকার, দ্বি-অবতল, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াস বিহীন; গড় ব্যাস ৭.৩μ ও স্থূলতা ২.২μ.	(i) O_2 ও CO_2 বহন করা। (ii) অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা।	১২০ দিন
শ্বেত রক্তকণিকা	(i) নিউট্রোফিল	৩-৫ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৩ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস ১০μ-১২μ.	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করা।	২-৪ দিন
	(ii) ইওসিনোফিল	১৫০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৭ খন্ডবিশিষ্ট। ব্যাস ১০μ-১২μ.	অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে।	৮-১২ দিন
	(iii) বেসোফিল	০-১০০	লাল অস্থিমজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার। ব্যাস ৮μ-১০μ.	হেপারিন ও হিস্টামিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্ত বাহিকার ভিতর জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়।	১২-১৫ দিন
	(iv) লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	প্লীহা, লাসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায় গোলাকার, বৃহদাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ৭μ-২২μ.	অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।	কয়েক ঘন্টা থেকে ১ দিন
	(v) মনোসাইট	৩৫০-৮০০	প্লীহা, লাসিকা, গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, বৃক্কাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ১০μ-১৮μ.	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে।	জানা নেই।
অণুচক্রিকা		আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ	লাল অস্থিমজ্জা	গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। ২.৫μ-৫μ ব্যাসবিশিষ্ট।	রক্তজমনে সহায়তা করে।	৫-১০ দিন

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অণুচক্রিকা
সংখ্যা	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৫০ লক্ষ।	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার।	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ২.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ।
নিউক্লিয়াস	২. প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও হিমোগ্লোবিন সঞ্চিত হবার পর নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়ে যায়।	২. সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে।	২. কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না।
বর্ণ	৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন থাকায় এগুলোকে লাল বর্ণের দেখায়।	৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এগুলো বর্ণহীন।	৩. বর্ণহীন।
আয়ু	৪. ১২০ দিন।	৪. ১-১৫ দিন।	৪. ৫-১০ দিন।
আকৃতি	৫. দ্বি-অবতল, চাকতির মতো।	৫. গোলাকার বা অনিয়ত।	৫. অনিয়ত আকৃতির।
কাজ	৬. O_2 পরিবহন।	৬. রোগ প্রতিরোধ।	৬. রক্ত তঞ্চন।

ব্যবহারিক অংশ

মানুষের রক্তের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

শনাক্তকরণ

১. রক্তের দুটি অংশ আছে– **প্লাজমা** ও **রক্তকণিকা**।

২. প্লাজমায় (রক্তরসে) তিন ধরনের রক্তকণিকা, যেমন–**লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকা** ও **অণুচক্রিকা** রয়েছে।

৩. লোহিতকণিকা দেখতে গোলা, দ্বিঅবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

৪. শ্বেতকণিকাগুলো অপেক্ষাকৃত বড়, অনিয়তাকার ও খন্ডিত নিউক্লিয়াসযুক্ত।

৫. অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াসবিহীন ও অতিক্ষুদ্র।

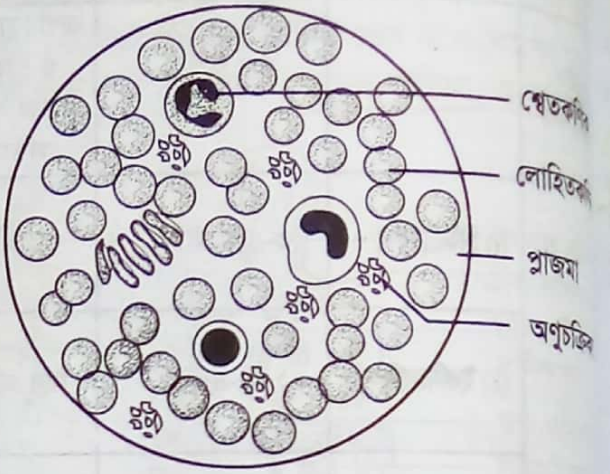

চিত্র ৪.৪ : মানুষের রক্তের স্লাইড

মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্রদেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে **হৃৎপিণ্ড** বলে। রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড **মানবদেহের পাম্পযন্ত্র** (pumping machine) রূপে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্পযন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি ভেন্ট্রিকল থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়। একটি হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম, স্ত্রীলোকে তা পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম হয়।

অবস্থান : মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে লালচে রংয়ের ও ত্রিকোণাকার; গোড়াটি চওড়া ও উর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুঁচালো শীর্ষদেশ নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে অবস্থান করে।

আকার ও আকৃতি : লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো। এর চওড়া উর্ধ্বমুখী অংশটি **বেস** (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি **এপেক্স** (apex)। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৯ সেন্টিমিটার।

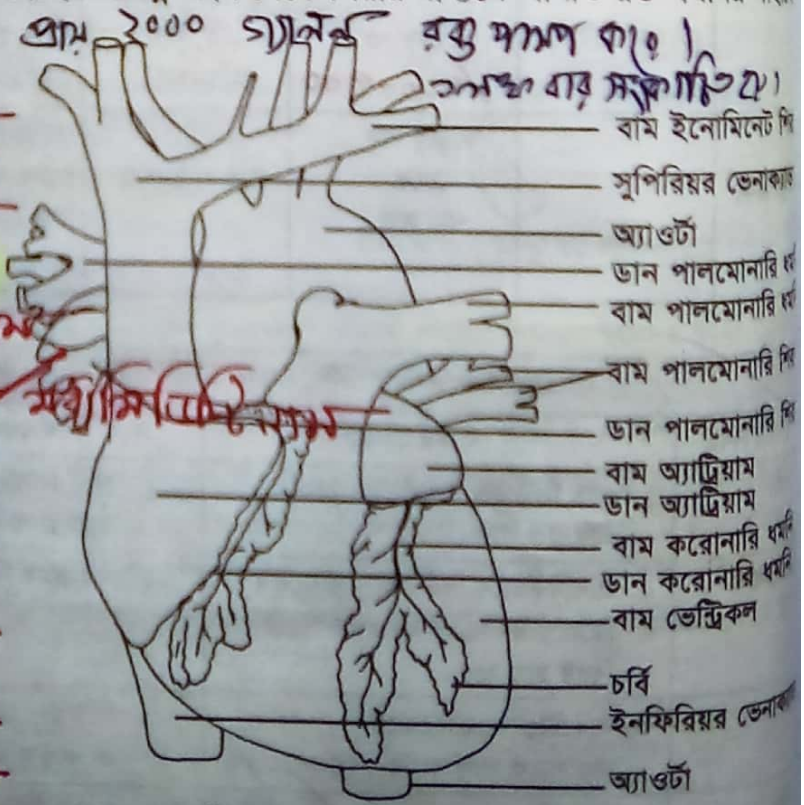

চিত্র ৪.৫ : হৃৎপিণ্ডের বহির্গঠন

আবরণ : হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণ দিয়ে আবৃত। এর নাম **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium)। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক **তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম** (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** (serous pericardium) নামে পরিচিত। সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, যথা : বাইরের

দিকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং ভিতরের দিকের **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer)। প্যারাইটাল ও ভিসেরাল স্তরদুটির মাঝে **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড** (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে। এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রাচীর : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশিতে গঠিত। এসব পেশি হৃৎপেশি বা **কার্ডিয়াক পেশি** (cardiac muscles) নামে পরিচিত। পেশিগুলো তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। যেমন–

১. **এপিকার্ডিয়াম** (Epicardium) : এটি হৃৎপ্রাচীরের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

২. **মায়োকার্ডিয়াম** (Myocardium) : এটি হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলোই হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **এন্ডোকার্ডিয়াম** (Endocardium) : এটি হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর যা হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎ-কপাটিকাগুলো ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of Heart)

মানুষের হৃৎপিণ্ড **চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট** একটি ফাঁপা অঙ্গ। উপরের প্রকোষ্ঠদুটিকে **ডান** ও **বাম অ্যাট্রিয়াম** বা **অলিন্দ** (right & left atrium; বহুবচনে-atria) এবং নিচের দুটিকে **ডান** ও **বাম ভেন্ট্রিকল** বা **নিলয়** (right & left ventricle) বলে। নিচে প্রকোষ্ঠগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

□ **অ্যাট্রিয়াম** (অলিন্দ) : অপেক্ষাকৃত পাতলা প্রাচীরযুক্ত (কারণ হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম রক্তকে শুধু ভেন্ট্রিকলে সঞ্চালিত করে) ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াদুটি হৃৎপিণ্ডের অগ্রাংশে পাশাপাশি অবস্থান করে। **আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল** (আন্তঃঅলিন্দ) **পর্দা** (inter-atrial septum) দিয়ে এরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকে। ডান অ্যাট্রিয়াম, **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** (ডান অলিন্দ– নিলয়) **ছিদ্র** (right atrio-ventricular aperture) পথে ডান ভেন্ট্রিকলের সাথে এবং বাম অ্যাট্রিয়াম, **বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** (বাম অলিন্দ-নিলয়) **ছিদ্র** পথে বাম ভেন্ট্রিকলের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথটি **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricuspid valve) নামক **ত্রিপত্রী** কপাটিকা দিয়ে এবং বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রটি **বাইকাসপিড** বা **মাইট্রাল কপাটিকা** (bicuspid or mitral valve) নামক **দ্বিপত্রী** কপাটিকা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। কপাটিকাগুলি এমনভাবে থাকে যাতে রক্ত শুধু অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে আসতে পারে কিন্তু ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাট্রিয়ামে ফেরত যেতে পারেনা। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকাপগুলি ভেন্ট্রিকল প্রাচীরের মাংসল অভিক্ষেপের সাথে **টেনডন তন্তু** (tendon fibre) দিয়ে যুক্ত থাকে। ভেন্ট্রিকল প্রাচীরের এ মাংসল অভিক্ষেপগুলিকে **প্যাপিলারি পেশি** (papillary muscle) এবং টেন্ডন তন্তুগুলিকে **কর্ডি টেন্ডিনি** (chordae tendinae) বলে। ডান অ্যাট্রিয়ামে **সুপিরিয়র** ও **ইনফিরিয়র ভেনাকেভা** পৃথক পৃথক ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রতি ফুসফুস থেকে আগত দুটি করে

হৃৎপেশীর বৈশিষ্ট্য

১. ছন্দময় সংকোচন প্রসারণ
২. সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক
৩. কেন্দ্রে ১টি নিউক্লিয়াস
৪. অপ্রকৃত সিনসাইসিয়াম
৫. ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক
৬. মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্যতা
৭. অনিয়মিতভাবে যুক্ত থেকে জালের মত গঠন তৈরি।

ফুসফুসীয় বা **পালমোনারি শিরা** উন্মুক্ত হয়। ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে **ইউস্টেশিয়ান** (eustachian) নামক কপাটিকা থাকায় রক্ত ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় ফিরে যেতে পারে না।

❐ **ভেন্ট্রিকল** (নিলয়) : এটি হৃৎপিণ্ডের পশ্চাতের মোচাকৃতি অংশ জুড়ে অবস্থিত এবং **আন্ত:ভেন্ট্রিকুলার** (আন্তঃনিলয়) **পর্দা** (interventricular septum) দিয়ে ডান ও বাম ভেন্ট্রিকলে পরস্পর পৃথক থাকে। ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীর অপেক্ষা পুরু হলেও বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর ডান ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশি পুরু থাকে। এর কারণ হচ্ছে ডান ভেন্ট্রিকল কেবল ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন করে কিন্তু বাম ভেন্ট্রিকলের সংকোচনে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়।

ডান ভেন্ট্রিকলের উপরিভাগ থেকে **পালমোনারি ধমনি** ও বাম ভেন্ট্রিকলের উপরিভাগ থেকে **সিস্টেমিক অ্যাওর্টা** উত্থিত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে **পালমোনারি কপাটিকা** এবং বাম ও সিস্টেমিক অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে **অ্যাওর্টিক কপাটিকা** নামক দুটি **অর্ধচন্দ্রাকার** বা **সেমিলুনার কপাটিকা** (semilunar valve) থাকে। পালমোনারি কপাটিকা রক্তকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনিতে এবং অ্যাওর্টিক কপাটিকা রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে সিস্টেমিক অ্যাওর্টায় প্রেরণ করে কিন্তু উভয় কপাটিকাই রক্তকে উল্টোপথে ফিরে আসতে দেয় না।

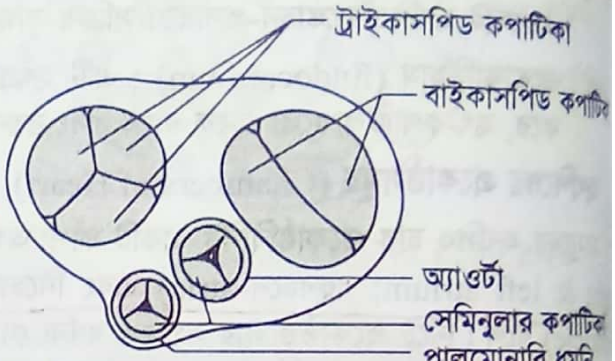

চিত্র ৪.৭ : হৃৎপিণ্ডের অংশ বিশেষের প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের কপাটিকা

মানুষের হৃৎপিণ্ডে বিভিন্ন কপাটিকার অবস্থান ও কাজ

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার নাম	অবস্থান	কাজ
১. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা	ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্তকে ডান ভেন্ট্রিকলে প্রেরণ করা, কিন্তু রক্তকে উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়া।
২. বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে প্রেরণ করা, কিন্তু রক্তকে উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়া।
৩. পালমোনারি কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে।	রক্তকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনিতে প্রেরণ করা, কিন্তু রক্তকে উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়া।
৪. অ্যাওর্টিক কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে অবস্থিত।	রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় প্রেরণ করা, কিন্তু রক্তকে উল্টোপথে যেতে বাধা দেয়া।
৫. থিবেসিয়ান কপাটিকা	করোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	হৃৎপিণ্ডগাত্র থেকে আগত রক্তকে ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রেরণ করা।
৬. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	রক্তকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রেরণ করা।

রুই মাছ এবং মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

রুই মাছের হৃৎপিণ্ড	মানুষের হৃৎপিণ্ড
১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।	২. দুটি অ্যাট্রিয়া ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৩. সাইনাস-ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।	৩. সাইনাস-ভেনোসাস নেই।
৪. কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৪. O_2-সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে।
৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।	৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।

হার্টবিট – কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলদুটির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভিতরে গতিশীল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর সংকোচনকে **সিস্টোল** (systole) ও প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট** বা **হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে **কার্ডিয়াক চক্র** বা **হৃৎচক্র** বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল $\frac{৬০}{৭৫} = ০.৮$ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্তসংবহন

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন কীভাবে হৃৎপিন্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল** (Atrial diastole) : এ সময় অ্যাট্রিয়ামদুটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। অ্যাট্রিয়াম-মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেও CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। অ্যাট্রিয়ামদুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ঘটে। এ দশার সময়কাল ৭ সেকেন্ড।

২. **অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল** (Atrial systole) : অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অ্যাট্রিয়াম কুচিত হয়। যদিও সংকোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান ট্রিয়ামের **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) থেকে সংকোচনের সূত্রপাত ঘটে। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল সেকেন্ড স্থায়ী হয়। প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম ০.০৫ সেকেন্ড সংকোচন সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, একে **ডায়নামিক** namic) পর্যায় বলে। আর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ পরবর্তী ০.০৫ সেকেন্ড ক্ষীণতর হতে হতে প্রশমিত হয়। একে **অ্যাডায়নামিক** (adynamic) পর্যায়।

অলিন্দের সিস্টোলঃ বাই ও ট্রাইকাসপিড খোলা।
অলিন্দের ডায়াস্টোলঃ বাই ও ট্রাইকাসপিড বন্ধ।
নিলয়ের সিস্টোলঃ বাই ও ট্রাইকাসপিড বন্ধ, সেমিলুনার খোলা।
অলিন্দের ডায়াস্টোলঃ বাই ও ট্রাইকাসপিড খোলা, সেমিলুনার বন্ধ।

হৃৎরোগ রোগ নির্ণয়

- চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখে হৃৎরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
- বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।
- ইসিজি (Electrocardiogram)- হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়ে ইসিজি সাহায্য করে।
- ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
- রক্তের BNP (brain natriuretic peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- করোনারি এনজিওগ্রাম-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
- হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানার জন্য MRI (magnetic resonance imaging) পরীক্ষা করা।
- উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা।

৩. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) : অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১-০.২ পর) ভেন্ট্রিকলদুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। এতে **লাব** (lub) সদৃশ প্রথম শব্দের সৃষ্টি হয়। ভেন্ট্রিকল-মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকলের বাইরে নির্গত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

৪. ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) : ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপরই এর ডায়াস্টোল শুরু এ দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড। যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু অতি দ্রুত সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে এ সময় **ডাব** (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, হৃৎপিন্ডের শব্দগুলো হচ্ছে–

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল= লাব (lub); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)।

অ্যাট্রিয়াম		ভেন্ট্রিকল	
ডায়াস্টোল	সিস্টোল	ডায়াস্টোল	সিস্টোল
০.৭ সে.	০.১ সে.	০.৫ সে.	০.৩ সে.

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর অভ্যন্তরের চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের নিচে নেমে যায় তখন অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আগত রক্তে পূর্ণ থাকে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার আগের মতো ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়।

হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পরিবহন
(Myogenic Regulation of Heart Beat and Transmission of Impulse)

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত–প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন করে এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। **বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ** (**myogenic** = muscle origin; myo = muscle + genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোন উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হৃৎস্পন্দন তৈরি হয়। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে O_2-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু সময় পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এই বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে সম্মিলিতভাবে **সংযোগী টিস্যু** বা **জাংশনাল টিস্যু** (junctional tissue) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো নিচে বর্ণিত ধরনের।

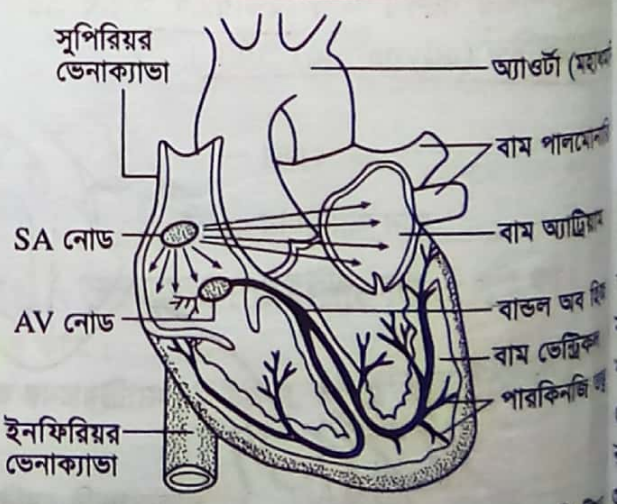

চিত্র ৪.৯ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

১. সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে SAN) : এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে অ্যাট্রিয়াম ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কিছু স্নায়ুপ্রান্তসহ সংখ্যক হৃৎপেশিতন্তু নিয়ে গঠিত। এগুলো ১০–১৫ mm লম্বা, ৩mm চওড়া এবং ১mm পুরু। SAN থেকে সৃষ্ট **অ্যাকশন পটেনসিয়াল** (action potential) ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এই অ্যাকশন পোটেনসিয়াল ছড়িয়ে সাথে সাথে স্নায়ু উদ্দীপনার অনুরূপ উত্তেজনার একটি ছোট তরঙ্গ হৃৎপেশির দিকে অতিক্রান্ত হয়। এটি অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে ছড়িয়ে অ্যাট্রিয়ামের সংকোচন ঘটায়। SAN কে **পেসমেকার** (pacemaker) বলে। প্রতিটি উত্তেজনার তরঙ্গ এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী উত্তেজনার তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেও এটি কাজ করে।

২. অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node, সংক্ষেপে AVN) : ডান অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকলের দীরে অবস্থিত SAN-এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্যের AVN টিস্যু **AV বান্ডেল** নামক বিশেষ পেশিতন্তু গুচ্ছের সাথে যুক্ত ক। AV বাণ্ডেল-এর মাধ্যমে হৃৎউদ্দীপনার ঢেউ অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে প্রবাহিত হয়। SAN থেকে AVN-এ ীপনার ঢেউ পরিবহনে ০.১৫ সেকেন্ড দেরি হয়। অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শুরুর আগে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল সম্পূর্ণ ।

৩. বান্ডল অব হিজ (Bundle of His) : হৃৎপিণ্ডের এই বিশেষ টিস্যুটি AV নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে ন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) প্রাচীরের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত হয়ে ভেন্ট্রিকলের রকিঞ্জি তন্তুতে মিলিত হয়। এটি AV নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে সঞ্চারিত করে।

৪. পারকিঞ্জি তন্তু (Purkinje fibre) : এ তন্তুগুলো বাণ্ডল অব হিজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে জালক করে। বান্ডল অব হিজ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা পারকিঞ্জি তন্তুর মাধ্যমে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেন্ট্রিকল র সংকোচন ঘটায়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপ :

SA নোড → AV নোড → বান্ডল অব হিজ → পারকিঞ্জি তন্তু

ক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা (Role of Baroreceptor in controlling Blood Pressure)

রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার

রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বলে। পিণ্ডের বিশেষত ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এর সংকোচনের ফলেই রক্ত ধমনির মধ্যদিয়ে অব্যাহতভাবে বহমান থাকে। **ট্রিকলের সংকোচন** (systole) অবস্থায় রক্তচাপ বেশি থাকে এবং এ চাপকে **সিস্টোলিক চাপ** (systolic pressure) । অপরদিকে **ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ** (diastole) কালে রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একে বলা হয় াস্টোলিক চাপ (diastolic pressure)। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে ১১০-১২০ mHg (মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ) এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ ৭০-৮০ mmHg. রক্ত স্বাভাবিক সীমার উপরে লে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension) এবং স্বাভাবিক সীমার নিচে থাকলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** (hypotension) । মানুষের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (sphygmomanometer) বলা হয়। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, াভাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে মানুষের রক্তচাপের তারতম্য ঘটে।

ব্যারোরিসেপ্টর

মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ **সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত** nsory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ বর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের সাম্য রক্ষা করে। এই সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে **রারিসেপ্টর** বলে। এসব স্নায়ু প্রান্ত অস্বাভাবিক রক্তচাপ ক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে ন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন মাত্রা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাপ স্বাভাবিককরণে ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক ক্রিয়াটি **ব্যারোরিফ্লেক্স** (bororeflex) নামে পরিচিত।

ব্যারোরিসেপ্টর দুরকম-**উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** এবং চাপ ব্যারোরিসেপ্টর।

১. উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (High-Pressure roreceptors) : অনুপ্রস্থ অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ডান ও অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনির **ক্যারোটিড সাইনাস**-এ এসব রোরিসেপ্টর অবস্থান করে। রক্তের চাপ বেড়ে গেলে াৎ রক্তনালির প্রসারণ ঘটলে সেখানকার রোরিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয় এবং এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কের লায় সঞ্চালিত হয় এবং এখানে **ভ্যাসোমটর**

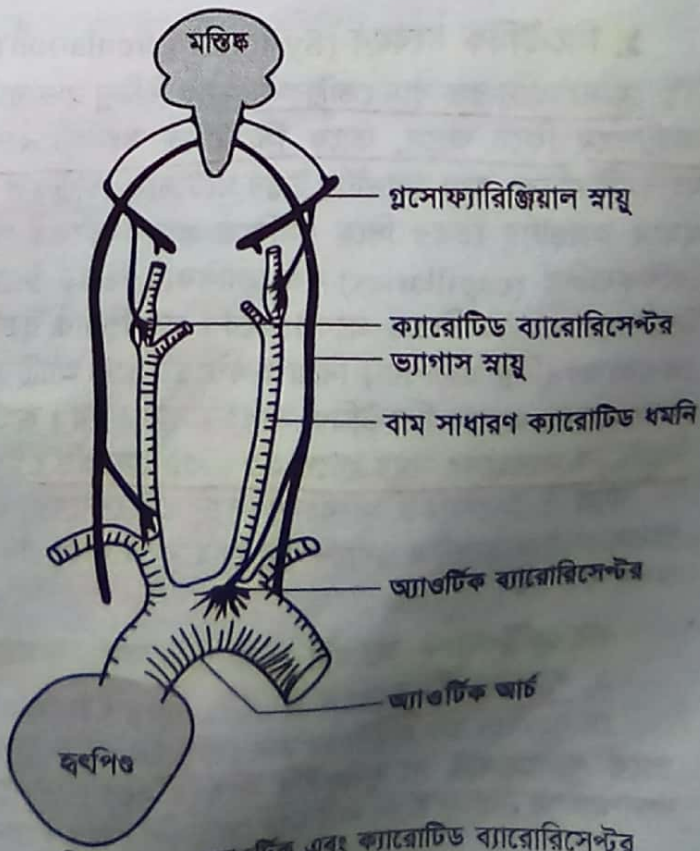

চিত্র ৪.১০ : অ্যাওর্টিক এবং ক্যারোটিড ব্যারোরিসেপ্টর

(vasomotor) কেন্দ্রটি দমিত হয়। ফলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু বরাবর হৃৎপিন্ড ও রক্তনালিতে চেষ্টীয় (mo... আজ্ঞাবহ উদ্দীপনা পরিবহনের হার হ্রাস পায়। আজ্ঞাবহ উদ্দীপনার কমতিতে হৃৎপিন্ডের পাম্পিং ক্রিয়া এবং ... মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনের মাত্রা কমে যায়। এভাবে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রক্ত চাপ পড়ে গেলে (যেমন–মানসিক আঘাতে) ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক ব্যারোরিসেপ্টর থেকে সংকেত ... গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ভ্যাগাস স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেডুলা অবলংগাটায় জড়ো হয়। মেডুলা ... তথ্যগুলো হৃৎপেশি, কার্ডিয়াক পেসমেকার, দেহের ধমনিকা বা আর্টারিওল (ধমনির সূক্ষ্ম শাখা) ও শিরায় প্রেরণ ... ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় ও সজোরে সংকুচিত হয় এবং ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

কার্ডিও পালমোনারি ব্যারোরিসেপ্টর

নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর (Low-Pressure Baroreceptors or Volume Receptors): বড় বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের ... ব্যারোরিসেপ্টরগুলো এ ধরনের। এসব রিসেপ্টর **রক্তের আয়তন** (blood volume) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ... স্বাভাবিক রাখে। রক্তের আয়তন কমে গেলে রক্তচাপও কমে যায়। তখন আয়তন রিসেপ্টর মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যা...** এ বার্তা প্রেরণ করে। ফলে পিটুইটারি গ্রন্থির নিউরোহাইপোফাইসিস কর্তৃক অ্যান্টিডাইউরিটিক বা ভ্যাসোপ্রেসিন ... ক্ষরণ বেড়ে যায়। উক্ত হরমোন বৃক্কনালিকা কর্তৃক পানি ও লবণ পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তের আয়তন বৃদ্ধির ... রক্তচাপ বাড়ায়। ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন সরাসরি রক্তনালিকার সংকোচন ঘটিয়েও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। রক্তের ... তথা চাপ কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় বা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপ্ত হওয়ায় বৃক্কের অন্তর্বাহী ধমনির **জাক্সটা-গ্লোমেরুলার** (juxtaglomerular cell) থেকে **রেনিন** এনজাইম ক্ষরণ বেড়ে যায়। রেনিন এনজাইমের কার্যকারিতায় কয়েকটি ... বিক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তের আয়তন বাড়িয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ **আয়তন রিসেপ্টরের প্রভাব রয়েছে রক্ত ... ও রেচন উভয় তন্ত্রে**।

মানবদেহে রক্ত সংবহন (Blood Circulation of Human Body)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ ধরনের** (closed type)। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির ... সঞ্চালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (do... circulation) অর্থাৎ **সিস্টেমিক** (systemic) ও **পালমোনারি** (pulmonary) চক্র পরিলক্ষিত হয়। মানবদে... প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা– ১. **সিস্টেমিক**, ২. **পালমোনারি**, ৩. **পোর্টাল** এবং ৪. **করোনারি**। নি... প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো থে... অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে। সব সিস্টেমিক ধমনির উদ্ভব হয় **অ্যাওর্টা** (aor... মহাধমনি থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে বাম ভেন্ট্রিকল থে... প্রথমে অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের **ধমনিকা** (arteri... কৈশিকনালির (capillaries) রক্ত জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহী... উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা (উর্ধ্ব মহাশিরা) ও ইনফি... ভেনাক্যাভা (নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত ডান ভেন্ট্রি... প্রবেশ করে। এভাবে সিস্টেমিক সংবহন সমাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত ... সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে ২৫ - ৩০ সেকেন্ড।

কাজ : সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিকজালিকা অতিক্রমকালে কোষে... খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্ট CO_2, রেচন পদার্থ ইত্যাদি কোষ ... অপসারিত হয়।

বাম ভেন্ট্রিকল→ অ্যাওর্টা→ টিস্যু ও অঙ্গ → মহাশিরা (ভেনাক্যাভা)→ ডান অ্যাট্রিয়াম→ডান ভেন্ট্রিকল

২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary Circulation)

যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে ... তাকে **পালমোনারি** বা **ফুসফুসীয় সংবহন** বলে। পালমোনারি সংবহনের শুরু হয় পালমোনারি ধমনি থেকে... পালমোনারি ধমনির উদ্ভব ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃ...

মানুষের রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র (Human Blood and Blood Circulatory System)

য়	ধমনী	শিরা
উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃৎপিন্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকনালীতে সমাপ্ত হয়	কৈশিকনালী থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিন্ডে সমাপ্ত হয়
ক্ত প্রবাহের দিক	হৃৎপিন্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে	দেহ থেকে হৃৎপিন্ডের দিকে পরিবহন করে
ক্তের প্রকৃতি	পালমোনারি ধমনী ছাড়া অন্য ধমনীগুলো O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের।	পালমোনারী শিরা ছাড়া অন্য শিরাগুলো CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের।
াচীর	বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক
ুমেন (গহ্বর)	লুমেন ছোট	লুমেন বেশ বড়
পাটিকা	কপাটিকা থাকে না	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে
বস্থান	প্রধানত দেহের গভীর অংশে বিস্তৃত থাকে	দেহের পরিধি অংশে বিস্তৃত থাকে
ক্ত চাপ	উচ্চ রক্ত চাপে রক্ত পরিবহন করে	কম চাপে রক্ত পরিবহন করে
ন্দন	আছে	নাই
কেটে গেলে	ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়	চুইয়ে রক্ত বের হয়

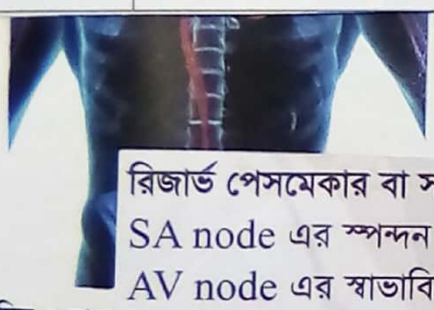

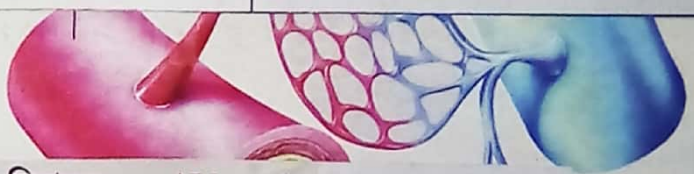

রিজার্ভ পেসমেকার বা সংরক্ষিত ছন্দ নিয়ামক → AV node
SA node এর স্পন্দন হার=৭২মিনিট (সর্বোচ্চ ১০০ বিট/মিনিট)
AV node এর স্বাভাবিক প্রক্ষেপণ গতি বা স্পন্দন হার মিনিটে ৪০-৬০ (গড়ে ৫০)
বান্ডল অব হিজ → প্রতি মিনিটে ৩৬ বার।
পারকিনজি তন্তু → প্রতি মিনিটে ৩০-৩৫ বার।

চিত্র ঃ মানব

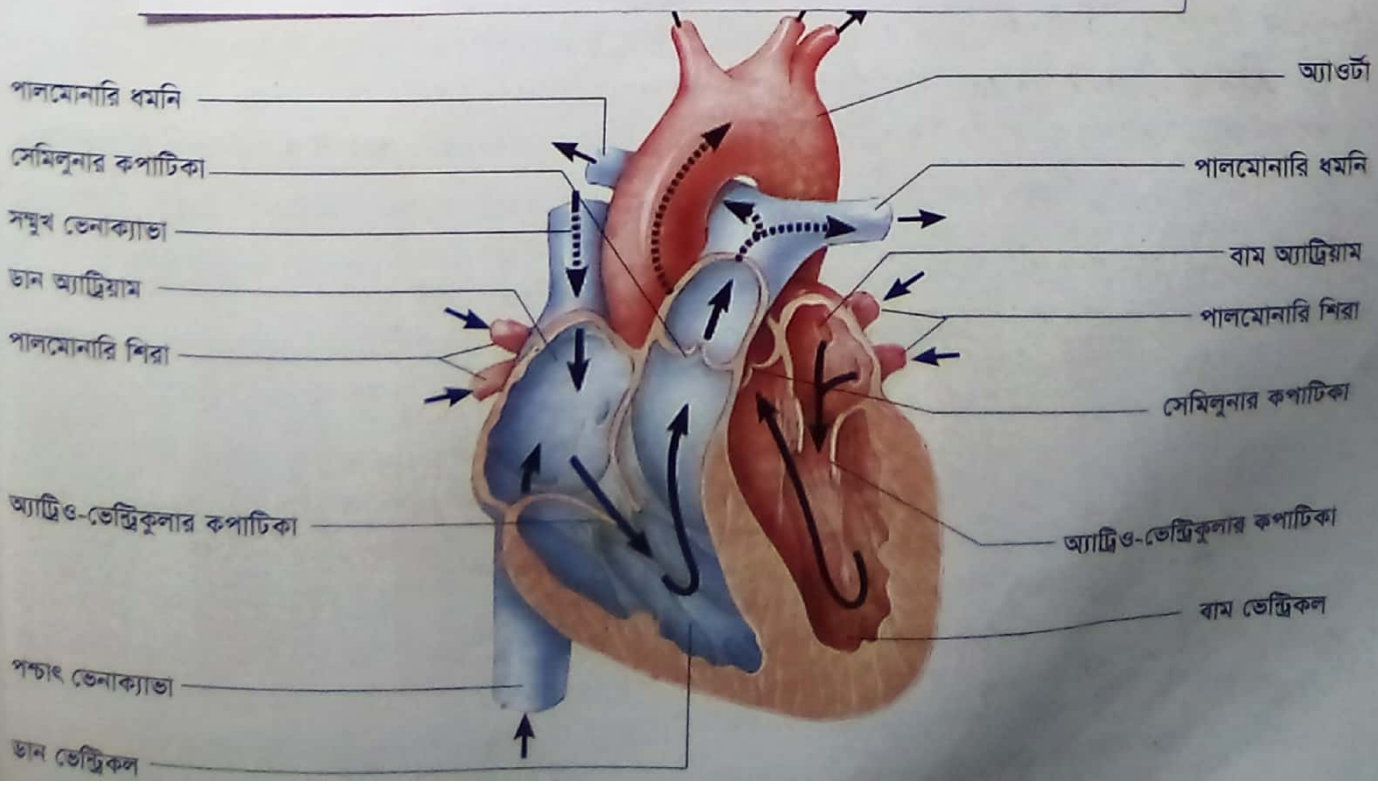

হৃদরোগের চিকিৎসা (Treatment of Heart Disease)

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ: হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে হলে একরকম এবং ডান পাশে হলে অন্যরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউর বাম পাশে হলে- ১। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও সময় কমে যায়; ২। কোনো কায়িক পরিশ্রমে শ্বাস কষ্ট হয়; ৩। শুষ্ক কফের সৃষ্টি হয় যা বের করা যায় না; ৪। ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্থ অনুভব করা; ৫। পেশির দুর্বলতা; ৬। দেহের ওজন কমে যায়।

হার্ট ফেইলিউর ডান পাশে হলে-১। পা ফুলে যাওয়া (ওডেমা); ২। পায়ের নিচের অংশের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়; ৩। পায়ে একজিমার মতো লাল দাগ পড়ে যা পরে জটিল ঘা এ পরিণত হয়; ৪। উদর গহ্বর এবং তদস্থিত অঙ্গগুলোতে তরল পদার্থ জমে বিশেষ করে ফুসফুস ও যকৃতে তরল জমে ফুলে যায়।

৪.৯ হৃৎরোগের চিকিৎসায় ধারণা

চিত্র ঃ মানবদেহে পেসমেকার স্থাপন

বেলুন এনজিওপ্লাস্টি

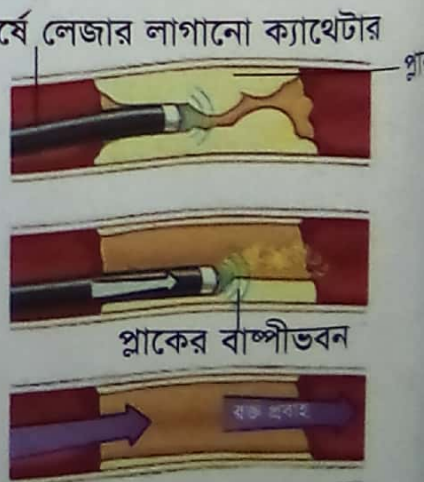

লেজার এনজিওপ্লাস্টি

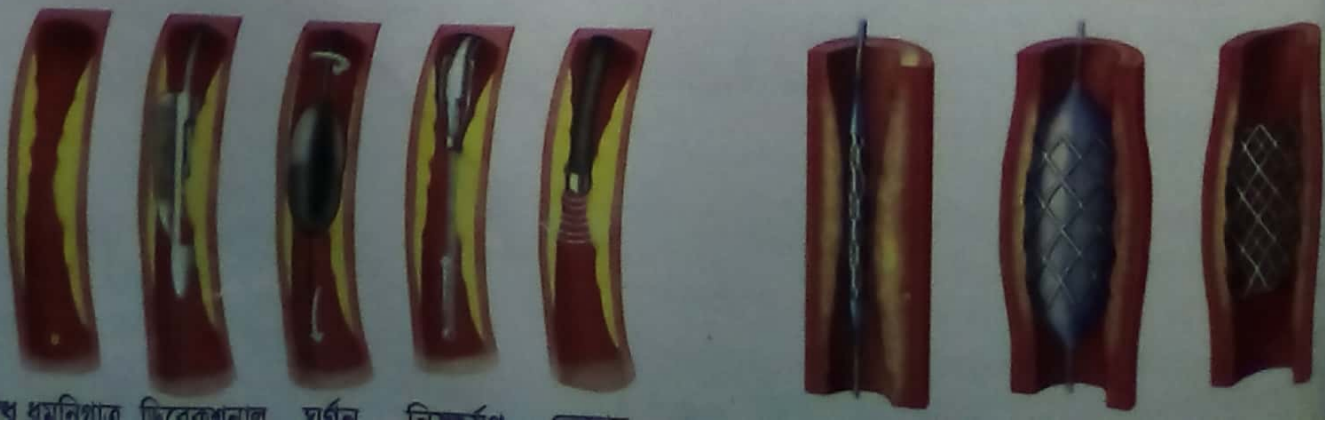

বন্ধ ধমনিগার ডিরেকশনাল ঘূর্ণন

পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। এরপর রক্ত ধমনিকা (arteriole) হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত কৈশিকনালিতে উপস্থিত হয়। কৈশিকনালি থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ক্ষুদ্রতর শিরা বা ভেনিউল (venule) এবং অবশেষে ৪টি (প্রতি ফুসফুস থেকে ২টি) পালমোনারি শিরার মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস → পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাট্রিয়াম → বাম ভেন্ট্রিকল।

কাজ : এ সংবহনের মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে সেখানে অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

৩. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সিস্টেমিক ও পালমোনারি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** বলে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত **যকৃত** বা **হেপাটিক** (hepatic) এবং **বৃক্কীয়** বা **রেনাল** (renal)-এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টাল সংবহন মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অনুপস্থিত।

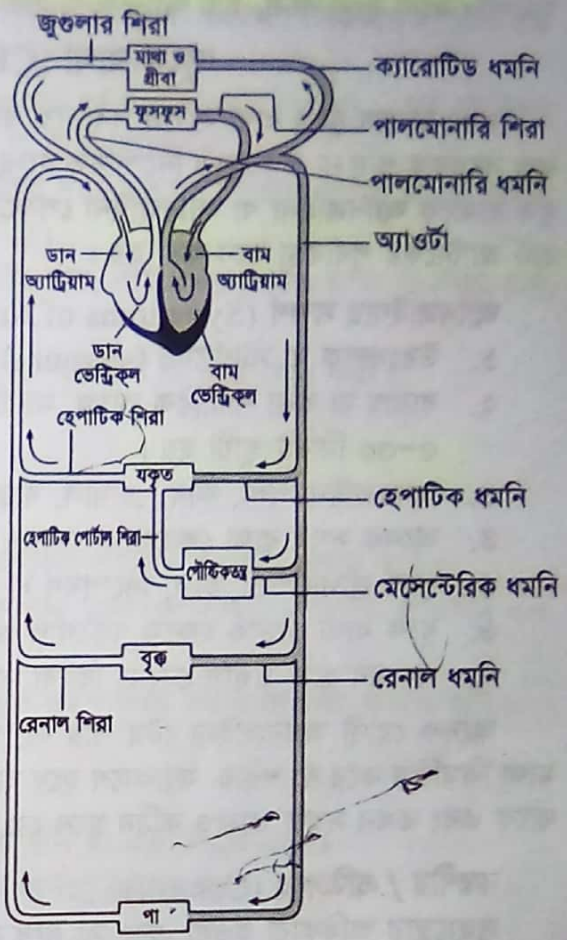

চিত্র ৪.১১ : মানুষের রক্ত সংবহনের চিত্ররূপ

হেপাটিক (যকৃত) পোর্টাল সংবহন: পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ও প্লীহা থেকে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (hepatic portal vein)-র ভিতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হয়। যকৃতে পৌঁছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়। এসব কৈশিক জালিকা পরে একত্রীকৃত হয়ে **হেপাটিক শিরা** (hepatic vein) গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়।

পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হেপাটিক শিরা → ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা → হৃৎপিণ্ড।

হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা : (i) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে আসে। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (ii) দূষিত নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। (iii) যকৃত রক্তে প্রোটিন উৎপাদন করে রক্তে সরবরাহ করে।

৪. করোনারি সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রত্যেক কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি **হৃৎপিণ্ড**। হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশিতে রক্ত সঞ্চালনকারি সংবহনকে **করোনারি রক্ত সংবহন** বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট **করোনরি ধমনির** মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৃৎপ্রাচীর → করোনরি শিরা → ডান অ্যাট্রিয়াম।

হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়
(Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের হৃৎপিণ্ডে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যার মধ্যে বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক ও হার্ট ফেইলিউর নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বুকে ব্যথা (Chest pain) বা অ্যানজাইনা (Angina)

নানা কারণে বুকে ব্যথা হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃৎপিন্ডজনিত বুক ব্যথা। হৃৎপেশি যখন O_2-সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে **অ্যানজাইনা** বা **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (angina / angina pectoris) বলে। অ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১. উরঃফলক বা স্টার্ণামের (sternum) পেছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
২. ব্যয়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতি ভোজন, শৈত্য বা আতংকে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
৩. অ্যানজাইনা গলা, কাঁধ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাঁতেও ছড়াতে পারে।
৪. অনেক সময় ব্যথা কোত্থেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
৫. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়।
৬. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গন্ডগোল ও বমি ভাব হতে পারে।
৭. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

নেক রোগী অ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কাঁধ ও বাহু ভারী হয়ে আসে। বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রোগী চিন্তান্বিত থাকে, মাথা ঝুলে থাকে। সারাদিন দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করে এবং তখন সহজ কাজও কঠিন মনে হয়।

করণীয় / প্রতিকার (Control)

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে রাখাই হচ্ছে অ্যানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্যে কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্গভেদে হৃদরোগ ও অ্যানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে: হাঁটা-চলা বা ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও হৃৎবান্ধব খাবার খাওয়া, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ত্যাগ করা; মদপানের ধারে কাছে না যাওয়া, বছরে একবার (সম্ভব হলে দুবার) সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া।

হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infarction)

হৃৎপেশির সুস্থতার জন্য ক্রমাগতভাবে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ জরুরি। করোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পেশিতে পৌঁছায়। চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির **প্লাক** (plaques) গঠন করে। একে **করোনারি অ্যাথেরোমা** (coronary atheroma) বলে। প্লাকের বহির্ভাগ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠে। এভাবে প্লাক শক্ত হতে হতে যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন এগুলো বিদীর্ণ হয়। অণুচক্রিকা জমা হয়ে প্লাকের চতুর্দিকে তখন রক্ত জমাট বাঁধাতে শুরু করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হৃৎপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায় এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম **মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন** (মায়োকার্ডিয়াল অর্থ হৃৎপেশি, আর ইনফার্কশন অর্থ অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হওয়া)।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ের ভিতর বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১. **বুকে অস্বস্তি** (Chest-discomfort) : বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ান, আছড়ান বা ব্যথা অনুভূত হয়।
২. **ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশে অস্বস্তি** (Discomfort in other areas of the upper body) : এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল বা পাকস্থলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব।
৩. **ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস** (Shortness of breath) : বুকে অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। অনেক সময় বুকে অস্বস্তি হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে।
৪. **বমি-বমি ভাব** (Nausea) : পাকস্থলিতে অস্বস্তির সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা অথবা ঠান্ডা ঘাম বেরিয়ে যাওয়া।
৫. **ঘুমে ব্যাঘাত** (Sleep problems) : ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শক্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ করা।

প্রতিরোধ

১. ঋতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে।
২. চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
৩. **বডি-মাস ইন্ডেক্স** (Body Mass Index, BMI) মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
৪. সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন- প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা ইত্যাদি) করতে হবে।
৫. ধূমপায়ী হলে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, অধূমপায়ী হলে ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।
৬. জীবনাভ্যাসে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ করে রাখতে হবে।
৭. কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৮. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা বন্ধ করতে হবে।
৯. বছরে অন্তত একবার (সম্ভব হলে দুবার) সমগ্র দেহ চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে।

হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

হৃৎপিন্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্তের যোগান দিতে পারে না তখন এ অবস্থাকে **হার্ট ফেইলিউর** বলে। অনেক সময় হৃৎপিন্ড রক্তে পরিপূর্ণ না হতে পারায়, কখনওবা হৃৎপ্রাচীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় এমনটি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উভয় সমস্যাই একসঙ্গে দেখা যায়। অতএব হার্ট ফেইলিউর মানে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তা নয়। তবে হার্ট ফেইলিউরকে হৃৎপিন্ডের একটি মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ

করোনারি ধমনির অন্তঃস্থ গাত্রে কোলেস্টেরল জমে ধমনির গহ্বর সংকীর্ণ করে দিলে হৃৎপ্রাচীর পর্যাপ্ত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। কালান্তরে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। উচ্চ রক্তচাপ বেশি দিন স্থায়ী হলে ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীরে কোলেস্টেরল জমার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস হলে দেহ পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিকভাবে ব্যবহারও করতে পারে না। এ কারণে ধীরে ধীরে হৃৎপেশি ও হৃৎপিন্ডের বাহিকাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। হৃৎপিন্ডে জন্মগত বা সংক্রমণজনিত কারণেও হার্ট ফেইলিউর ঘটতে পারে।

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ

১. সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা এবং ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. সাদা বা গোলাপি রঙের রক্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস।

৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে।
৪. পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা পড়তে গেলে হঠাৎ আঁটসাট মনে হয়।
৫. প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। বাজার-সদাই করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা শু সবকিছুতেই শ্রান্তিভাব।
৬. পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি ভাব থাকে।
৭. হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত হয় মনে হবে যেন হৃৎপিন্ড এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৮. কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্জস এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার

অসুখের শুরুতেই হার্ট ফেইলিউরের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলে এবং প্রতিকার সম্বন্ধে সতর্ক হ রোগীর তেমন সমস্যা থাকে না, সক্রিয় জীবন যাপনেও কোনো কিছু বাধা হয় না। হার্ট ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীকে সাধারণত ৩ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়।

১. **জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন :** স্বাস্থ্যসম্মত আহার হচ্ছে রোগীদের প্রধান অবলম্বন। চিকিৎসকের পরা অনুযায়ী খাদ্য তালিকা দেখে নিয়মিত সুষম পানাহার করা উচিত।

২. **ওষুধ গ্রহণ :** হার্ট ফেইলিউরের ধরন দেখে চিকিৎসক যে সব ওষুধ নির্বাচিত করবেন নিয়মিত তা সেবন ক হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. **অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া :** হার্ট ফেইলিউর যেন খারাপের দিকে মোড় না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বি শারীরিক অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে হবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন- শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া অর্থ হচ্ছে টিস্যুতে পানি জমে থাকা। চিকিৎসককে বলতে হবে কখন ওজন পরীক্ষা করাতে হবে এবং ও পরিবর্তন সম্বন্ধে কখন তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে।

উল্লিখিত ৩টি প্রতিকার পদ্ধতিতে কাজ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা বা অন্য কোনো ধরণ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা (The Concept of the Treatment of Heart Diseases)

আধুনিক বিশ্বে হৃদরোগের গবেষণার ফসল হিসেবে বেশ কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নিচে এরূপ কয়েক চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পেসমেকার (Pacemaker)

হৃৎপিন্ডে ডান অ্যাট্রিয়াম-প্রাচীরের উপর দিকে অবস্থিত, বিশেষায়িত কার্ডিয়াক পেশিগুচ্ছে গঠিত ও স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট অংশ যা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং স্পন্দনের ছন্দময় বজায় রাখে তাকে **পেসমেকার** বলে। মানুষের হৃৎপিন্ডে **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) পেসমেকার। এটি অকেজো বা অসুস্থ হলে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্থাপন করা হয় তাকেও পেসমেকার বলে। অতএব, পেসমেকার দুধরনের- একটি হচ্ছে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SA নোড) যা **প্রাকৃতিক পেসমেকার** নামে পরিচিত; অন্যটি হচ্ছে **যান্ত্রিক পেসমেকার**, অসুস্থ প্রাকৃতিক পেসমেকারকে নজরদারির মধ্যে রাখে। প্রাকৃতিক পেসমেকারের কার্যক্রম কার্ডিয়াক চক্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হলো।

যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities)

অসুস্থ ও দুর্বল হৃৎপিন্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বুকে উদরে চামড়ার নিচে স্থাপিত ছোট এক বিশেষ যন্ত্রকে **পেসমেকার** বলে। দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে হৃৎপিন্ডের সুস্থতা বজায় ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত জরুরী। হৃৎপিন্ডের সুস্থতা পরিমাপের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর লয় বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়ত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্পন্দ

হলে তাকে **অ্যারিথমিয়া** (arrhythmia) বলে। এমন অবস্থায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বা শ্বাসকাশে হয়ে যেতে পারে। প্রচন্ড অ্যারিথমিয়ায় দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে সব ধরনের অ্যারিথমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাকি জীবন সক্রিয় থাকা যায়। দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।

যান্ত্রিক পেসমেকারের গঠন

একটি লিথিয়াম **ব্যাটারি**, কম্পিউটারাইজড **জেনারেটর** ও শীর্ষে **সেন্সরযুক্ত** কতকগুলো তার নিয়ে একটি পেসমেকার গঠিত। সেন্সরগুলোকে **ইলেকট্রোড** (electrode) বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। ব্যাটারি ও জেনারেটর একটি পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিন্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকান্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে।

পেসমেকারে অপরিরাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। পেসমেকারের তারকে **লিড** (lead) বলে। হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

১. **এক-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Single-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিন্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এ বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

২. **দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Dual-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিন্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

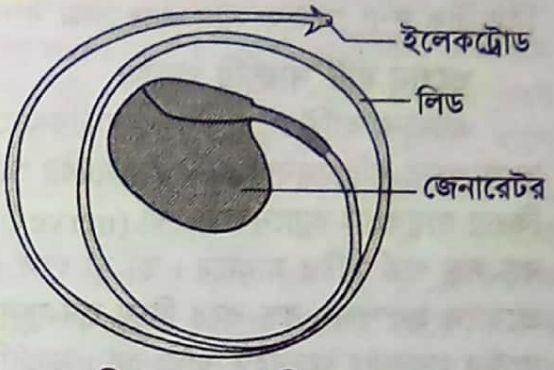

চিত্র ৪.১২ : যান্ত্রিক পেসমেকার

৩. **ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Triple-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার (লিড) থাকে যার একটি জেনারেটর থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে, আরেকটি ডান ভেন্ট্রিকলে এবং অন্যটি বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল হৃৎপেশির হৃৎপিন্ডে স্থাপন করা হয় (না হলে হার্ট ফেইলিউরের সম্ভাবনা থাকে)। পেসমেকার এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকলদুটিকে সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে গতি ঘটায়।

পেসমেকার যেভাবে কাজ করে

জেনারেটরের কম্পিউটার-চিপ এবং হৃৎপিন্ডে যুক্ত সেন্সরবাহী তার ব্যক্তির চলন, রক্তের তাপমাত্রা, শ্বসন ও বিভিন্ন শারীরিক কর্মকান্ড মনিটর করে। প্রয়োজনে কর্মকান্ডের ধারা অনুযায়ী হৃৎপিন্ডকে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। এসব কাজে লাগিয়ে পেসমেকার ঠিক করে দেয় কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাগবে এবং কখন লাগবে। যেমন-পেসমেকার ব্যক্তির ব্যায়াম করার বিষয়টি বুঝতে পেরে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এসব উপাত্ত পেসমেকারে রক্ষিত থাকে যা দেখে চিকিৎসকেরা পেসমেকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। কম্পিউটারের সাহায্যেই যেহেতু পেসমেকারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা যায় তাই পেসমেকারে ছুরি-কাঁচি চালানোর প্রয়োজন পড়ে না। পেসমেকারের ব্যাটারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মেয়াদ থাকে ৫-১০ বছরের মতো।

ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর বুক কেটে উন্মুক্ত করে হৃৎপিন্ডে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে **ওপেন হার্ট সার্জারি** বলে। এটি একটি বড় শল্যচিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যা ও রোগ মুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্য সব চিকিৎসার পরও যদি হৃৎপিন্ডে বড় ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় থাকে না।

ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ

ওপেন হার্ট সার্জারী প্রধানত নিচে বর্ণিত তিন উপায়ে করা হয়।

১. **অন-পাম্প সার্জারি** (On-pump surgery) : এ ধরনের সার্জারীতে একটি হৃদ-ফুসফুস মেশিন **কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস** (cardiopulmonary bypass) নামে পরিচিত সেটি ব্যবহার করা হয়। এ সামায়িকভাবে হৃৎপিন্ডের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পাম্প করে বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রেরণ করে হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় শল্যচিকিৎসক যখন অস্ত্রোপচার করেন তখন হৃৎপিন্ডে রক্তও থাকে না, হৃৎস্পন্দ হয় না।

২. **অফ-পাম্প সার্জারি বা বিটিং হার্ট** (Off-pump surgery or Beating heart) : এ ধরনের সার্জারিতে ফুসফুস মেশিন ব্যবহৃত হয় না, বরং চিকিৎসক সক্রিয় হৃৎস্পন্দনরত হৃৎপিন্ডেই অস্ত্রোপচার করেন। তবে হৃৎস্পন্দ হার ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে সামান্য মন্থর করে রাখা হয়।

৩. **রোবট-সহযোগী সার্জারি** (Robot-assisted surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে শল্যচিকিৎসক কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে।

ওপেন হার্ট সার্জারি পদ্ধতি

একজন কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসকের অধীনে একটি শল্যচিকিৎসক দল ওপেন হার্ট সার্জারির মতো অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন। সার্জারির শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া (general anesth কিংবা স্নায়ুবন্ধক অ্যানেসথেসিয়া (nerve block anesthesia) প্রয়োগ করা হয়। সার্জারি শুরু হয় বুক ও স্টার্ণাম বড়-সড় গর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে। তা না হলে রোগীর ভিতরটা ভালোমতো দেখা যায় না। অন-পাম্প সার্জারি হলে প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিয়ে **হৃদ-ফুসফুস মেশিন** (heart-lung machine)-এর সাহায্যে পাম্প করে সার রক্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। সার্জারি শেষে মেশিন খুলে নেয়া হয়।

অন্যদিকে, করোনারী আর্টারী বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকপাটিকা মেরামত বা পুনঃস্থাপন করার সময় সার্জন প্রচলিত বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে তার ভিতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে দে অভ্যন্তরভাগ দেখেন মনিটরে। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে, সংক্রমণজনিত জটিলতা হয়। রোগীর ব্যক্তিগত পছন্দ, শনাক্তকরণ, বয়স, অসুখের ইতিহাস, স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রভৃতির উপর এ ধরনের সার্জারি করে। 1950 সালে Dr. Wilford G. Bigellow সর্বপ্রথম Openheart Surgery প্রয়োগ করেন।

সাবধানতা

জটিল কার্ডিওভাস্কুলার অসুখে ওপেন হার্ট সার্জারির স্মরণাপন্ন হতে হয়। অন্ততঃ বাংলাদেশে এ সার্জারি মোটেও কম নয়। সার্জারির পর ভুক্তভোগীকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। যেমন-হৃৎপিন্ড সুস্থ রাখে এমন আহার নিয়মিত ব্যায়াম করা; বয়স-উচ্চতার সঙ্গে মিল রেখে ওজন ঠিক রাখা; চাপ থেকে মুক্ত থাকা; ধূমপান ছেড়ে দেয় উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা।

কাজ : তোমার বাবার বয়স ষাটের উপরে। তাঁর যেন কোন ধরনের হৃদরোগ না হয় সেজন্য তাঁকে কী কী পরামর্শ

করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

এক বা একাধিক করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) রুদ্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ অব্যাহত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহের অন্য অংশ থেকে (যেমন-পা থেকে) একটি সুস্থ রক্তবাহিকা (ধমনি বা শিরা) কেটে রুদ্ধ ধমনির পাশে স্থাপন করে রক্ত সরবরাহের যে বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় তাকে **করোনারি বাইপাস** বলে। করো বাইপাস সৃষ্টির সামগ্রিক অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়াটিকে **করোনারি বাইপাস সার্জারি** বলা হয়।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির রুদ্ধতা। এর মূল কারণ ধমনির অন্তঃস্থ ঘিরে ক্রমশ সঞ্চিত হওয়া উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ। ধমনি প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়ামে এ জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্তু পুঞ্জিভূত হয়ে শক্ত হতে শুরু করে এবং চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এ প্রক্রি **আর্টারিওস্ক্লেরোসিস** (arteriosclerosis) বলে। আর পুঞ্জিভূত পদার্থগুলোকে বলে **অ্যাথেরোমেটাস**

(atheromatous plaques)। প্লাকসের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন হৃৎপেশি O_2-সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ এসব জটিলতা এড়াতে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সরবরাহ করার বিকল্প পথের সৃষ্টি করতে হয়। বাইপাস সড়কের মতো হৃৎপিন্ডে বাইপাস ধমনি নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস প্রভৃতি ধমনি গাত্রে প্লাক জমার কাজ ত্বরান্বিত করে। তা ছাড়া, ৪৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সি নারীর ক্ষেত্রে কিংবা পরিবারের ইতিহাসে যদি করোনারি ধমনি সংক্রান্ত ব্যাধির নজির থেকে থাকে তাহলে আরও কম বয়সে করোনারি বাইপাস করার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

যখন করোনারি ধমনির লুমেন ৫০–৭০% সংকীর্ণ হয় তখন থেকেই O_2–সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ হৃৎপেশিতে কমে যায়। বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। প্লাকের চূড়ায় যদি রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে পরিস্থিতি হার্ট অ্যাটাকের দিকে চলে যায়।

ধমনির লুমেন যদি ৯০–৯৯% সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন **অস্থির অ্যানজাইনা** (unstable angina) ত্বরান্বিত হয়। এমন অবস্থায় করোনারি বাইপাস কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

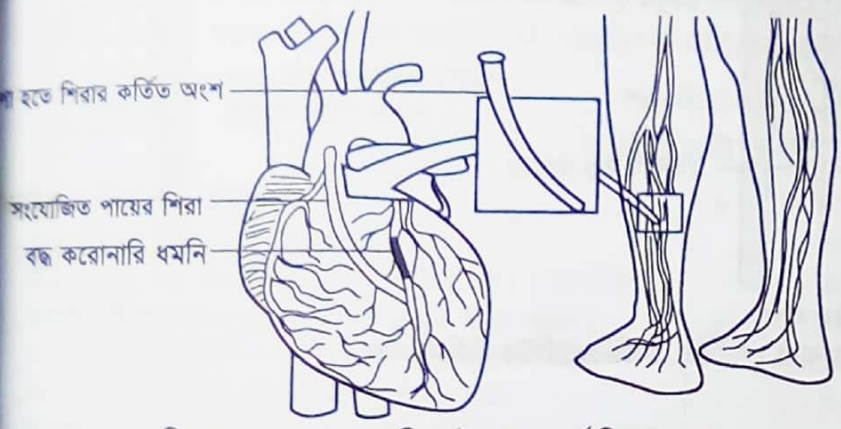

চিত্র ৪.১৩ : করোনারি বাইপাস সার্জারি
(বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন)

করোনারি বাইপাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। রোগ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় হৃদচিকিৎসক প্রথমে করোনারি ধমনির রোগের সঠিক অবস্থান, ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয় করেন। পরবর্তী ধাপে রোগীর হৃৎপিন্ড, বয়স, লক্ষণের ব্যাপকতা, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের অবস্থা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিবেচনা করে হৃদ ও শল্যচিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। রুদ্ধ করোনারি ধমনিকে এড়িয়ে ভিন্নপথ নির্মাণ করতে বুক, হাত, পা ও তলপেট থেকে ধমনি সংগ্রহ করা হয়। কয়টি করোনারি ধমনি বাইপাস করতে হবে তার উপর নির্ভর করে অস্ত্রোপচারের সময়কাল। সাধারণত ৩-৫ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বাইপাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে ২ মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এরপর থেকে রোগীকে নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হয়।

বিধিনিষেধ

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন– ধূমপান ত্যাগ; কোলেস্টেরলের চিকিৎসা; উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ; ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ; নিয়মিত নির্ধারিত ব্যায়াম; স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা; হৃদ-বান্ধব ভোজনে অভ্যস্ত হওয়া; চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা; নির্ধারিত ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা।

এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

বড় ধরনের অস্ত্রোপচার না করে হৃৎপিন্ডের সংকীর্ণ লুমেন (গহ্বর)-যুক্ত বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুক্ত বা উন্মুক্ত করার পদ্ধতিকে **এনজিওপ্লাস্টি** (angio = রক্তবাহিকা + plasty = পুনর্নির্মাণ) বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভিতর দিয়ে হৃৎপিন্ডে পর্যাপ্ত O_2 সরবরাহ নিশ্চিত করে হৃৎপিন্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা), হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির সহজ উপায় এনজিওপ্লাস্টি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের **ডাঃ অ্যানড্রেস গ্রয়েনজিগ** সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ

এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) চওড়া করে O_2-সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা। প্লাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টির ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এনজিওপ্লাস্টি ৪ ধরনের। বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (Ballon angioplasty), লেজার এনজিওপ্লাস্টি (Laser angioplasty), অ্যাথরেকটমি (Athrectomy) ও করোনারি স্টেন্টিং (Coronary Stenting)।

উল্লিখিত ধরনগুলোর মধ্যে **করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টি** বর্তমানে বেশি প্রচলিত। নিচে এর বর্ণনা দেয়া হ

এনজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়া

এনজিওগ্রাম (angiogram) করে নিশ্চিত হওয়ার পর এধরনের সার্জারি করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে ঊর্ধ্ব বা পা-এর একটি অংশ কেঁটে ধমনির ভিতর দিয়ে পাতলা নল বা **ক্যাথেটার** (catheter) প্রবেশ করিয়ে কৌশলে বুক আংশিক বুজে যাওয়া ধমনিতে পৌছানো হয়। ক্যাথেটারে একটি সরু তার, তারের অগ্রভাগে একটি চুপসানো বেলুন বেলুনটির চারদিকে একটি ধাতব তারের জালের চোঙ বসানো থাকে। জালিকাটিকে **স্টেন্ট** (stent) বলে। স্টে সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এখন অবশ্য অন্যান্য ধাতব বা বিশেষ ধরনের সুতার তৈরি স্টেন্টও ব্যবহৃত হ

চিত্র ৪.১৪ : করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টির বিভিন্ন ধাপ

স্টেন্টসহ বেলুন কাঙ্খিত জায়গায় পৌছালে বেলুনটি বাইরে থেকে ফোলানো হয়। বেলুনের সাথে সাথে স্টেন্ট স্ফীত হয় এবং প্রতিবন্ধক স্থানে চাপ দিতে থাকে। চাপের ফলে ধমনিরগহ্বরের প্রতিবন্ধক স্থানে চর্বিযুক্ত পদার্থ নিষ্পেশিত হয় এবং সংকীর্ণ ধমনিগহ্বর প্রশস্ত হয়। ধমনির ভিতরে তখন রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে এর পর সেন্টটি ধমনিগহ্বরে রেখে দিয়েই বেলুন সংকুচিত করে বাইরে বের করে আনা হয়। স্টেন্ট সবসময় ধমনি অন্তঃপ্রাচীরকে বাইরের দিকে চেপে রাখে বলে ধমনির ভিতরে সহজে চর্বিপদার্থ (অ্যাথেরোমা /ব্লক) জমতে পারে স্টেন্টের গায়ে এক ধরনের প্রলেপ লাগানো থাকে যা চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সংকীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভিতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত O সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃ হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপ্লাস্টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয় হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। যেহেতু বুক উন্মুক্ত করতে হয় না সেহেতু কষ্ট, সংক্রমণ দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘন্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পা এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

যাঁরা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাঁদের বয়স বছরের বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।